প্রকৃতি ও শরীয়ত স্বীকৃত অধিকার

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল উসাইমিন রহ.

অনুবাদ : মোঃ আব্দুল মতিন

সম্পাদনা : আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2012 - 1434

IslamHouse.com

حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة

« باللغة البنغالية »

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ترجمة: محمد عبد المتين

مراجعة: أبو بكر محمد زكريا

2012 - 1434

IslamHouse.com

প্রকৃতি ও শরীয়ত স্বীকৃত অধিকার

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, তারই নিকট ক্ষমা প্রাথনা করছি এবং তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। আর আমরা আমাদের প্রবৃদ্ধির যাবতীয় কুমন্ত্রণা এবং অন্যায় কাজ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কারণ (আমরা জানি যে) যাকে আল্লাহ তা'আলা সৎপথ প্রদর্শণ করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই। আর যাকে বিপদগামী করেন তাকে রক্ষা করারও কেউ নেই।

আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব উপাস্য নেই। তিনি এক ও একক। তার কোনো অংশী নেই। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর সংগী-সাথী ও তাঁর সমস্ত অনুসারীর ওপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক।

স্মর্তব্য যে, আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতের সৌন্দর্য ও সুষমা ঠিক তখনই প্রতিভাত হতে পারে যখন অত্যন্ত ইনসাফপূর্ণভাবে তার প্রতি যত্নবান হওয়া যায়। অর্থাৎ সে ব্যাপারে কোনো প্রকার হ্রাস-

বৃদ্ধি তথা সংকীর্ণতা ও অতিরঞ্জন না করে প্রত্যেককেই তার প্রাপ্য অধিকার দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা সমাজে আদল ও ইনসাফ কায়েম করবে, লোকদের প্রতি ইহসান করবে এবং আত্মীয়-এর অধিকার সংরক্ষন করবে। আল্লাহ তা'আলা ইনসাফের ভিত্তিতেই এই পৃথিবীতে রাসূলদের প্রেরণ করেছেন, কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কাজ-কর্ম পরিচালনা করছেন।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, 'আদল' কি। আসলে আদল হচ্ছে এই যে, প্রত্যেককে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকারসমূহ সঠিকভাবে অর্পণ করা। অধিকার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ব্যতীত তা পালন করা আদৌ সম্ভব নয়। এগুলো জানা থাকলেই কেবল প্রত্যেককে তার প্রাপ্য মর্যাদায় ভুষিত করা যেতে পারে। আমি আলোচ্য গ্রন্থে বিশেষ বিশেষ কতিপয় অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পেলাম। আমি বিশ্বাস করি, যদি কোনো ব্যক্তি এগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন, তা হলে তিনি তার সাধ্যানুযায়ী সেগুলোকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে পারবেন।

অধিকারগুলো হচ্ছে এই :

১. আল্লাহর অধিকার।

২. রাসূলের অধিকার।

৩. পিতা-মাতার অধিকার।

৪. সন্তান-সন্ততির অধিকার।

৫. আত্মীয়-স্বজনের অধিকার।

৬. স্বামী-স্ত্রীর অধিকার।

৭. শাসক ও শাসিতের অধিকার।

৮. প্রতিবেশীর অধিকার।

৯. সাধারণ মুসলিমদের অধিকার।

১০. অমুসলিমদের অধিকার।

সংক্ষেপে এ অধিকারগুলোকেই আমরা আলোচনা করব।

এক : আল্লাহর অধিকার

সমস্ত অধিকারের মধ্যে এই অধিকারই হচ্ছে বড় অধিকার। যেহেতু সমগ্র ব্যবস্থাপনা ও সৃষ্টির নিয়ামক হচ্ছেন সে মহান স্রষ্টা- তাই এই অধিকারকে সর্বাগ্রে স্বীকার করে নেয়ার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। আর তার এ অধিকার একান্তই সুস্পষ্ট। কারণ, তিনি হচ্ছেন চিরঞ্জীব ও চিরবিদ্যমান এক মহান সত্তা যাকে কেন্দ্র করেই আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তিনি প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন এবং অতিশয় নিপুনতা সহকারে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার অবয়ব এবং গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আল্লাহর অধিকার এই যে, (হে মানুষ!) তিনি তোমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে রূপান্তরিত করেছেন। অর্থাৎ এমন এক সময় ছিল যে তোমার অস্তিত্ব বলতে কোনো জিনিসই ছিল না। অতঃপর তিনি তোমার অস্তিত্ব দান করেছেন। এটাও আল্লাহর একটি অধিকার যে, তিনি তোমাকে তোমার মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময়ে অফুরন্ত নেয়ামত দ্বারা প্রতিপালন করেছেন। তুমি মায়ের উদরে তিনটি অন্ধকার স্তরের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছো- যেখানে সৃষ্টিলোকের কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। আর এমন কেউ ছিল না যে সেখানে তোমার জন্য খাদ্য পরিবেশন করতে

পারে, তোমার জন্য জীবন ধারনের উপকরণ সরবরাহ করতে পারে। তিনিই তা করেছেন। তোমার জীবিকার জন্য তিনিই তোমাদের মায়ের স্তনে দুগ্ধ-ধারা সরবরাহ করেছেন এবং তোমাদের দুটি পথের সন্ধান দিয়েছেন। হ্যাঁ, শৈশবে তোমার লালন পালনের জন্য তোমার পিতা-মাতাকে তিনিই দয়াপরবশ করে সৃষ্টি করেছেন-যারা তোমার জন্য সবকিছুর যোগান দিচ্ছেন। আল্লাহ তা‘আলা তোমার জন্য অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। তোমাকে জ্ঞান ও বুঝশক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলার সে সব নেয়ামত গ্রহণ করে উপকৃত হওয়ার শক্তিও তোমাকে তিনি দান করেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿ وَٱللَّهُ أَخۡرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٧٨ ﴾ [النحل: ٧٨]

“আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের উদর থেকে ভূমিষ্ঠ করেছেন। (এ অবস্থায়) তোমরা কিছুই জানতে না। অতঃপর তিনি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও অন্তকরণ দান করেছেন। আর তা

এই জন্য যে, তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।” [সূরা আন-নাহল:৭৮]

যদি এক মুহুর্তের জন্যও তিনি তোমার নিকট থেকে তার সমুদয় অবদানকে সরিয়ে নেন, তা হলে তুমি নিশ্চিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যেতে। তোমার ওপর থেকে যদি মুহুর্তের জন্যও করুণা উঠিয়ে নেয়া হতো তা হলে তুমি কিছুতেই জীবন ধারণ করতে পারতে না।

সুতরাং তোমার ওপর যখন আল্লাহর এত অফুরন্ত করুণা বর্ষিত হয়েছে ও হচ্ছে, তখন তোমার কর্তব্য হলো তার সে অধিকারগুলোর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা। কারণ, এটি হচ্ছে তোমার সৃষ্টি, তোমরা প্রতিপালন এবং তোমার জন্য জীবন ধারণের যাবতীয় উপকরণ সরবরাহের বিপরীতে তাঁর অধিকার।

আর আল্লাহ তা‘আলা তো তোমার নিকট থেকে কোনো প্রকার রিযিক বা খাদ্য-সামগ্রী চান না। আল্লাহ বলেন:

﴿لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقٗاۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكَۗ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلتَّقۡوَىٰ ١٣٢﴾ [طه: ١٣٢]

‘আমিতো তোমার কাছ থেকে রিযিক প্রত্যাশা করি না! বরং আমিই তোমাকে রিযিক সরবরাহের করে থাকি। বস্তুত উৎকৃষ্ট পরিণাম তো তাকওয়ার জন্যই।” [সূরা ত্বা-হা: ১৩২]

আল্লাহ তা‘আলা তোমার কাছ থেকে একটি জিনিস চেয়েছেন; যার স্বার্থ তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনি তোমার কাছে চাচ্ছেন, তুমি একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে; যার কোনো শরীক নেই। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝٥٦ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۝٥٧ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۝٥٨ ﴾ [الذاريات: ٥٦، ٥٨]

‘জিন ও ইনসানকে আমি সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদতের জন্য। আমি তাদের কাছ থেকে রিযিক কামনা করি না এবং আমি চাই না যে আমাকে খাবার সরবরাহ করা হোক। নিশ্চয়ই আল্লাহ রিযিকদাতা এবং তিনিই বেশি শক্তিশালী।” [সূরা আয-যারিয়াত:৫৬-৫৮]

আল্লাহ চাচ্ছেন বন্দেগীর সামগ্রিক অর্থেই তুমি যেন নিজেকে আল্লাহর একজন খাঁটি বান্দা হিসাবে পরিচয় দিতে সক্ষম হও,

যেমন আল্লাহ তা'আলা প্রতিপালনের সামগ্রিক অর্থেই একজন প্রতিপালক। অতএব, তুমি তার একজন অনুগত বান্দাহ হবে এটাই কাম্য। তুমি তার যাবতীয় নির্দেশ অবনত মস্তকে মেনে নিবে, তার নিষিদ্ধ কার্যগুলো থেকে দূরে থাকবে এবং তার যাবতীয় খবর তথা বাণীকে সমর্থন করবে। তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ যে, আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহ তোমার ওপর কতটা পরিপূর্ণ। কাজেই তুমি কি আল্লাহর এই সব নেয়ামতকে কুফরের সাথে পরিবর্তন করতে লজ্জা বোধ কর না?

তোমার ওপর যদি কেউ করুণা করতো তা হলে তার বিরুদ্ধারণ করতে তুমি নিশ্চয়ই লজ্জাবোধ করতে। সুতরাং যে আল্লাহ তোমার ওপর এতটা দয়াবান তুমি কি করে তার বিরুদ্ধাচারণ করতে পার? তোমার ওপর থেকে যেসব দুঃখ-কষ্ট এবং অপছন্দনীয় কাজ রহিত করা হয় জেনে রাখবে, তা সবই তার করুণার ফলশ্রুতি। যেমন বলা হয়েছে:

﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ ٥٣ ﴾ [النحل: ٥٣]

‘তোমাদের ওপর যেসব নেয়ামত বর্ষিত হচ্ছে, তা সবই আল্লাহর দান। অতঃপর যখন তোমাদের ওপর কঠিন বিপদ-আপদ পতিত হয় তখন তোমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর।’ [সূরা আন-নাহল: ৫৩]

এটা তাঁর স্বীয় অধিকার। তাঁর এ অধিকারকে পালন ও বোঝার জন্য তিনি তা সহজ করে দিয়েছেন। কারণ, এর মধ্যে কোন প্রকার সংকীর্ণতা, আবিলতা ও কঠিন কিছু নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَىٰكُمۡۖ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ٧٨ ﴾ [الحج: ٧٨]

‘আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর সত্যিকারের জিহাদ। তিনিই তোমাদেরকে (এ কাজের জন্য) নির্বাচিত করেছেন। আর তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো প্রকার সংকীর্ণতা

আরোপ করেন নি। এ দ্বীন হচ্ছে তোমাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীমের দ্বীন। আর তিনিই তোমাদেরকে মুসলিম নামে অভিহিত করেছেন ইতোপূর্বে এবং বর্তমানে। এটা এই জন্য যে, যাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী হতে পারেন, আর তোমরাও সাক্ষী হবে সমগ্র মানুষের। অতএব, তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহর দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। আর কতইনা উত্তম অভিভাবক ও উত্তম সাহায্যকারী তিনি।' [সূরা আর-হাজ্জ: ৭৮]

নিশ্চয়ই এ হচ্ছে একটি স্বত:সিদ্ধ এবং পরিপূর্ণ আকিদা। আর সত্যের ওপর পুর্ণ ঈমান আনয়ন করা, সৎকর্মে নিয়োজিত হওয়া বান্দার জন্য একান্তই ফলপ্রসু। এ এমন একটি আকিদা যার ভিত্তিসমূহের অন্যতম হচ্ছে ভালবাসা ও সম্মানবোধ, আর তার ফল হচ্ছে নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়।

আল্লাহর অধিকারসমূহের মধ্যে আরেকটি অধিকার হচ্ছে এই যে, দিবা-রাত্রির মধ্যে পাঁচবার নামায আদায় করা। আল্লাহ তা'আলা এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে বান্দার যাবতীয় পাপ মোচন

করে থাকেন। এ দ্বারা তার মর্যাদা বুলন্দ করেন এবং তার অন্তকরণ ও হাল অবস্থার পরিশুদ্ধি ঘটিয়ে থাকেন। আল্লাহর প্রকৃত বান্দাগণ তাদের সাধ্যানুসারে তা আদায় করে থাকে। আল্লাহ বলেন,

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: ١٦]

'তোমাদের শক্তি অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করে চলো।' [সূরা আত-তাগাবুন: ১৬]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগশয্যায় শায়িত ইমরান ইবন হুসাইনকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

'দাড়িয়ে নামায আদায় কর। আর যদি দাড়াতে সক্ষম না হও তা হলে বসে বসে নামায পড়; আর যদি তাও না পার তা হলে শুয়ে শুয়ে নামায আদায় কর[1]।'

---

[1] বুখারী, হাদীস নং ১১১৭।

আল্লাহর অধিকারের মধ্যে আর একটি অধিকার হচ্ছে যাকাত। এ হচ্ছে ধনী ব্যক্তির সম্পদের অংশ বিশেষ-যা যাকাত পাওয়ার যোগ্য মুসলিমদের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রদান করা হয়ে থাকে। আর যাকাত পাওয়ার যোগ্য তথা 'আহলে যাকাত' হচ্ছে ফকির, মিসকিন, পথিক, ঋণগ্রস্ত, প্রভৃতি শ্রেণীর লোক।

আরেকটি অধিকার হচ্ছে রমযানের রোজা। বছরে একমাস রোযা রাখা প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। আর যারা অসুস্থ হয়ে পড়বে অথবা সফরে থাকবে তারা অন্য সময়ে তা আদায় করে নেবে। আর যে ব্যক্তি শারীরিক অক্ষমতার দরুণ রোযা রাখতে অপারগ সে প্রতিদিন একজন মিসকিন ব্যক্তিকে খাদ্য দিবে।

আরেকটি অধিকার হচ্ছে বাইতুল্লাহর হজ্জ। অর্থনৈতিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম প্রতিটি মুসলিমের জন্য জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরয। এ বুনিয়াদি বিষয়গুলোই হচ্ছে আল্লাহর অধিকার।

আর এসব ছাড়া বান্দার উপর আরও কিছু অধিকার রয়েছে যা শুধুমাত্র হঠাৎ করে আপতিত হয়, যেমন, আল্লাহর পথে জিহাদ।

অথবা কোনো কারণে সেটা ওয়াজিব হয় যেমন, মযলুমের সাহায্য করা।

হে আমার প্রিয় ভাই ! আল্লাহর এসব অধিকারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন, এগুলো কর্মের দিক থেকে সামান্য কিন্তু পুণ্যের দিক থেকে অনেক বেশি। এগুলো যথাযথ পালন করলে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যশালী হতে পারবে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশেরও সুযোগ লাভ করবে। আল্লাহর ভাষায় :

﴿فَمَن زُحۡزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدۡخِلَ ٱلۡجَنَّةَ فَقَدۡ فَازَۗ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ ١٨٥﴾ [ال عمران: ١٨٥]

‘আর যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখা হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে দেয়া হয়েছে, সেতো উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আর (স্বরণ রাখবে) এই পার্থিব জীবন প্রবঞ্চনার বিষয়-সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নয়।’ [সূরা আলে ইমরান: ১৮৫]

দুই : রাসুলের অধিকার

সৃষ্টিকুলের মধ্যে সব চেয়ে বড় অধিকার হলো এই অধিকারটি। অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকারের চেয়ে বড় অধিকার আর কিছুই হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ۝٨ لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُۚ﴾ [الفتح: ٨، ٩]

'হে, রাসূল! আমরা আপনাকে একজন সাক্ষ্যদানকারী, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। যাতে তোমরা আল্লাহ রাসূলের ওপর ঈমান আনয়ন কর এবং শ্রদ্ধা ও সম্মান কর।' [সূরা আল-ফাতহ: ৮,৯]

আর এজন্যই সমগ্র মানবজাতির ভালোবাসার ওপর রাসূলের প্রতি ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক করা হয়েছে। এমনকি ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হচ্ছে তার নিজের, তার

পিতা-মাতা ও সন্তান সন্ততির ভালোবাসার চেয়ে রাসূলের ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেওয়া।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

‘কোন মানুষ মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষন পর্যন্ত না আমি তার নিকট, তার সন্তান সন্তুতি, তার পিতা-মাতা ও মানবকুলের মধ্যে প্রিয় ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত না হই[2]।’

রাসুলের অধিকারসমূহের মধ্যে আর একটি অধিকার হলো এই যে, কোন প্রকার অতিরঞ্জন বা সংকীর্ণতা ব্যতিরেকেই তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদার প্রতি যথাযথ যত্নবান হওয়া। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি সম্মানের অর্থ হচ্ছে, তার ব্যক্তিসত্তা ও তাঁর আনীত সুন্নাতের সম্মান। তাঁর তিরোধানের পরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মানে হচ্ছে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত ও শরীয়াতের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। আর যারা রাসূলের জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি সাহাবায়ে

---

[2] বুখারী, ১৫; মুসলিম, ৪৪।

কেরামের শ্রদ্ধা নিবেদনের দৃশ্যটি অবলোকন করেছেন তারা অবশ্যই জানেন যে, সে সব বুজুর্গ রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে কতটা যত্নবান ছিলেন।

‘উরওয়া ইবন মাস‘উদ, যিনি ‘হোদায়বিয়ার সন্ধির’ ব্যাপারে রসূলুল্লাহর দরবারে আলাপ আলোচনার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলেন :

لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ، وَكِسْرَى، وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا، كان إِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ

‘আমি রোমের কায়সার, পারস্যের কিসরা এবং আবিসিনিয়ার নাজ্জাশীর দরবারেও উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচরবৃন্দ যেভাবে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে তেমনটি কোথাও দেখি নি। যখন তাদেরকে কোনো কাজের নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তারা ত্বরিতগতিতে তা সম্পাদন করে এবং তাদের বিনয় ভাবের অবস্থা এই যে, মনে হয়

যেন তারা তাঁর সম্মুখে আপন আপন প্রাণ বিলিয়ে দিতে প্রস্তত রয়েছে। আর যখন তাঁর সাথে কথা বলে তখন অতীব নীচু স্বরে কথা বলে। সম্মানের আতিশয্যে তারা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না[3]।'

মোটকথা, এভাবেই সাহাবীগণ তাকে সম্মান করতেন, তাছাড়াও তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্র, বিনম্র স্বভাব ও সহজলভ্য মানুষ। তিনি যদি কর্কশভাষী ও কঠোর হতেন তাহলে অবশ্য লোকেরা তার নিকট থেকে দূরে সরে যেতো।

রাসুলের অধিকারের মধ্যে আরেকটি হচ্ছে এই যে, তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী সম্পর্কে যা কিছু বলেন, তা সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং তিনি যা নির্দেশ দেন তা মেনে নেয়া ও তিনি যে ব্যাপারে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকা। আর এই মর্মে ঈমান পোষণ করা যে, তাঁর প্রদর্শিত হেদায়াতই পরিপূর্ণ হেদায়াত এবং তাঁর আনীত শরীয়াতই পরিপূর্ণ শরীয়াত। তাঁর ওপর অন্য

[3] বুখারী, হাদীস নং ২৭৩১।

কোনো জীবন পদ্ধতি ও পন্থাকে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥ ﴾ [النساء: ٦٥]

'হে নবী, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আপনাকে তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদে বিচারক হিসাবে না মানবে এবং আপনি যা ফায়সালা প্রদান করবেন নিসংকোচে তা মেনে না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুমিন হতে পারবে না।' [সূরা আন-নিসা: ৬৫]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١ ﴾ [ال عمران: ٣١]

'হে নবী! আপনি বলে দিন যে, যদি তোমরা আল্লাহকে বালবাস তাহলে আমার আনুগত্য স্বীকার কর। আর এরূপ করলেই আল্লাহ তোমাদেরকে বালবাসবেন, তোমাদের পাপ মোচন করে দিবেন।

কারণ, আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।' [সূরা আলে-ইমরান: ৭২]

রাসূলের অধিকারসমূহের মধ্যে আর একটি অধিকার হচ্ছে এই যে, মানুষ তার সাধ্যানুসারে এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে হলেও রাসূলের শরীয়াত ও অনুশাসনের প্রতিরক্ষার কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখবে। অতএব, শত্রু যদি যুক্তিতর্ক দিয়ে শরীয়াতের মোকাবিলা করে, তা হলে জ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে তার মোকাবিলা করতে হবে এবং তার বিরুদ্ধাচরণের ভয়াবহ দিকগুলোও তুলে ধরতে হবে। আর যদি তারা অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়াতের মোকাবিলা করে তাহলে অনুরূপ ভাবেই তা মোকাবিলা করতে হবে।

আর এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, একজন মুমিনের সামনে তার নবীর শরীয়াতের ওপর আক্রমণ হবে অথচ তার শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে।

তিন : মাতা-পিতার অধিকার

ছেলে-মেয়েদের ওপর মাতা-পিতার অধিকার ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এই পৃথিবীতে সন্তান তথা ছেলে-মেয়েদের অস্তিত্ব লাভের কারণই হচ্ছে মাতা-পিতা। সুতরাং সন্তানের উপর তাদের অধিকার যে কত বড়, কত ব্যাপক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভূমিষ্ট লাভের পর সন্তানকে তারাই লালন-পালন করেন। সন্তানের আরামের জন্য ক্লান্তি বহন করেছেন, তাদের নিদ্রার জন্য নিজেরা জাগ্রত থেকেছেন। তোমার মা তোমাকে তার উদরে ধারণ করেছেন। যেখানে দীর্ঘ নয় মাসাধিক সময় তারই খাদ্য ও স্বাস্থের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করেছ। এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'আলা তার বাণীতে বলেন,

﴿حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ﴾ [لقمان: ١٤]

'তাকে তার মা দুর্বল থেকে দুর্বলতর অবস্থার মধ্য দিয়ে পেটে ধারণ করেছেন।' [সূরা লুকমান: ১৪]

অতঃপর সে মা-ই আরো দু’বছর পর্যন্ত অসীম কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে তাকে দুধ পান করিয়েছেন, তার সেবা যত্ন করেছেন।

শৈশব থেকে নিজের পায়ে দাড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত পিতা তার সন্তানের জীবন ধারণ, তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও খাদ্য-বস্ত্রের জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়েছেন। তার শিক্ষা-দীক্ষা এবং পরিচালনার যাবতীয় ব্যবস্থা সে পিতাই করেছেন। অর্থাৎ এমন অবস্থায় পিতা-মাতা তাদের সন্তানের জন্য সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব বহন করেছেন যখন তুমি তোমার ভালো-মন্দ এবং কল্যাণ-অকল্যাণের কোনো ক্ষমতাই রাখতে না। আর এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা সন্তানকে মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও কৃতজ্ঞতার আচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿ وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤ ﴾ [لقمان: ١٤]

‘আর আমরা লোকদেরকে আমার এবং তাদের মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য উপদেশ দিয়েছি, তার মা তাকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর অবস্থার মধ্য দিয়ে পেটে ধারণ করেছে এবং

দু'বছর পর্যন্ত দুধ পান করিয়েছে-আর তাদেরকে আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' [সূরা লুকমান: ১৪]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًاۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝٢٣ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۝٢٤﴾ [الاسراء: ٢٣، ٢٤]

'আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের কোন একজন অথবা উভয়ই যখন তোমাদের কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের কোন একজন অথবা উভয়ই যখন তোমাদের কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাদের বেলা উফ (উহ) এই শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং রূঢ় ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের দূরে সরিয়ে দিও না। বরং তাদের উভয়ের সাথেই ভদ্রভাবে কথাবার্তা বলো। তাদের জন্য তোমার আনুগত্য ও দয়ার হস্ত প্রসারিত করে দাও এবং আমার নিকট এই বলে প্রার্থনা কর: হে রব ! তাদের অনুরূপ দয়া করো যেমনটি তারা করেছেন আমার সাথে আমার শৈশবে।' [সূরা আল-ইসরা: ২৩-২৪]

মাতা-পিতার অধিকার এই যে, কথা ও কাজে এবং শারীরিক ও আর্থিক উভয় দিক দিয়েই ছেলে-মেয়েদেরকে তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কথায় নম্রতা ও চেহারায় সদাহাস্যভাব বজায় রাখতে হবে। ছেলে-মেয়েকে তাদের যে কোনো আদেশ যা সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে এবং তাদের জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত নয়-তা পালনে তৎপর থাকতে হবে। বার্ধক্য, অসুখ-বিসুখ ও দুর্বলতায় আক্রান্ত হলে তাদের প্রতি খিটখিটে আচরণ ও ক্রোধ প্রকাশ করা যাবে না। ঠিক হবে না তাদের এ করুণ অবস্থাকে নিজেদের উপর বোঝা স্বরূপ মনে করা। কেননা, কিছু দিনের মধ্যেই ছেলে-মেয়েদেরকেও সে অবস্থায়ই উপনীত হতে হবে। অর্থাৎ সন্তানগণও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাদের পিতা-মাতার সারিতে পৌঁছে যেতে বাধ্য।

মোটকথা, মাতা-পিতা যেমন সন্তানের জীবদ্দশায় বাধ্যক্যে উপনীত হয়ে থাকে, তেমনিভাবে সন্তানগণও একদিন তাদের সন্তানগণের সম্মুখে অনুরূপ বার্ধক্যে উপনীত হবে। তখন তারাও ঠিক মাতা-পিতার মতোই তাদের ছেলে-মেয়েদের সদ্ব্যবহারের তীব্র

প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে- যেমন করছেন বর্তমানে তাদের মাতা-পিতা।

কাজেই সন্তানগণ যদি তাদের পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করে তা হলে তাদের জন্যও তার বিনিময় রয়েছে অফুরন্ত পূণ্য ও সম প্রতিদান। মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে তার সন্তানগণ থেকেও সে অনুরূপ আচরণ আশা করতে পারে। আর যে ব্যক্তি তার মা বাবার সাথে অবাধ্য আচরণ করবে সে তার ছেলে-মেয়েদের দ্বারা লাঞ্ছিত হবে- এটাই স্বাভাবিক। কারণ, 'যেমন কর্ম তেমন ফল'।

আল্লাহ্ তা'আলা পিতা-মাতার অধিকারকে সুমহান উচ্চে স্থান দিয়েছেন। আল্লাহ ও রাসূলের অধিকারের পরেই হচ্ছে এ অধিকারটি। তাই তো আল্লাহ বলেন:

﴿ ۞وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا﴾ [النساء: ٣٦]

'হে লোক ! তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর তার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করো না এবং পিতা-মাতার সাথে ইহসান (সদ্ব্যবহার) করো।' 'আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 'আমার এবং

তোমাদের পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।’ [সূরা আন-নিসা: ৩৬]

আরও বলেন,

﴿أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤﴾ [لقمان: ١٤]

“যাতে তুমি আমার জন্য কৃতজ্ঞ হও এবং পিতা-মাতার প্রতিও” [সূরা লুকমান: ১৪]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহারকে আল্লাহর পথে জিহাদের উপরে স্থান দিয়েছেন। এই মর্মে ইবনে মাস‘উদ রা. থেকে একটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। ইবনে মাস‘উদ রা. বলেন,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا» قَالَ: قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» «الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

“‘আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল ! কোন কাজটি আল্লাহর কাছে সব চেয়ে বেশী প্রিয়। তিনি বলেন- সঠিক ওয়াক্তে নামাজ

আদায়। আমি বললাম তার পর কোনটি। তিনি বললেন : মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার। আমি বললাম : তারপর কোনটি। তিনি বললেন ; আল্লাহর পথে জিহাদ। (বুখারী ও মুসলিম)।'

উপরে বর্ণিত এই হাদীসটি পিতা-মাতার অধিকারের গুরুত্বের কথাটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বৈ কি! অথচ আমাদের সমাজের অনেক লোকই মাতা-পিতার প্রতি অন্যায় আচরণ এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের সে প্রাপ্য অধিকারটিকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। আমাদের সমাজে এমন লোকের সংখ্যা কম নয়, যারা না তাদের পিতার আর না তাদের মাতার অধিকারের প্রতি বিন্দুমাত্র যত্নবান হচ্ছে। অধিকন্তু তারা তাদের অবাধ্য আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত করে থাকে। সুতরাং যারা এরূপ মন্দ আচরণ করে তারা আজ হোক আর কাল হোক এর প্রতিফল ভোগ করবেই।

চার : সন্তান সন্তুতির অধিকার

ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই সন্তানের মধ্যে গণ্য। সন্তান সন্ততির অধিকার অনেক। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে শিক্ষা লাভের অধিকার। তবে আল্লাহর দ্বীন এবং চরিত্র গঠনের জন্যই এ শিক্ষা; যাতে তারা তাতে বেশ উৎকর্ষতা লাভ করতে সমর্থ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ﴾ [التحريم: ٦]

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিজদেরকে ও তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর- যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।' [সূরা আত-তাহরীম]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

‘তোমাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের রাখাল (তত্ত্বাবধায়ক) এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তাই আখেরাতে তার রাখালির (তত্ত্বাবধান) জন্য জিজ্ঞাসিত হবে, একজন মানুষ তার পরিবারের রাখাল, তাকে সে রাখালিপনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।’ [বুখারী, মুসলিম]

প্রকৃত প্রস্তাবে সন্তান বা ছেলে মেয়েগণ হচ্ছে পিতা মাতার স্কন্ধে এক বিরাট আমানতস্বরূপ। অতএব, কিয়ামতের দিন তাদের উভয়কেই তাদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, এমতাবস্থায় পিতা মাতার দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে ধর্মীয় এবং নৈতিক তথা উভয়বিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সংশোধন পূর্বক গড়ে তোলা। এরূপ করা হলেই তারা ইহকাল এবং আখেরাতে পিতা-মাতার জন্য চোখের শীতলতা তথা শান্তি বয়ে আনবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَمَآ أَلَتۡنَٰهُم مِّنۡ عَمَلِهِم مِّن شَيۡءٖۚ كُلُّ ٱمۡرِيِٕۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٞ ٢١ ﴾ [الطور: ٢١]

‘আর সে সব লোক যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে, অতঃপর তাদের সন্তানগণও ঈমানের সহিত তাদের পত অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে আমি মিলিত করব। আর আমি তাদের কোন আমলই বিনষ্ট করবনা। প্রতিটি লোক যা কিছু আমল করে তা আমার নিকট দায়বদ্ধ থাকে।’ [সূরা আত-তূর: ২১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»

‘যখন কোনো লোক মারা যায়, তখন তার ‘তিনটি আমল’ ব্যতীত সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। উক্ত তিনটি কাজ বা আমল হচ্ছে সাদকায়ে জারিয়া, এমন ইলম বা জ্ঞান যা দ্বারা তার মৃত্যুর পরও লোকেরা উপকৃত হতে থাকে এবং এমন কোনো সুসন্তান, যে তার পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য দো‘আ করে।’ [তিরমিযী, নাসাঈ]

ছেলে মেয়েদেরকে সুশিক্ষা ও শিষ্টাচারের সহিত গড়ে তোলার এইটাই হচেছ ফল, যে এই ধরণের ছেলে-মেয়েরাই পিতা-মাতার

জন্য এমনকি তাদের মৃত্যুর পরও কল্যাণকামী হিসেবে পরিগণিত হয়।

অনুতাপের বিষয় যে, আমাদের সমাজে অনেক পিতা-মাতাই এই অধিকারটাকে অত্যন্ত সহজ মনে করে নিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে তারা তাদের ছেলে-মেয়েদের কে ধ্বংস করে দিচ্ছেন এবং তাদের কথা যেন ভুলেই গেছেন। মনে হয় যেন তাদের ব্যাপারে তাদের ওপর কোনো দায়িত্বই নেই। তাদের ছেলে-মেয়েরা কোথায় গেল এবং কখন আসবে, কাদের সাথে তারা চলা ফেরা করছে অর্থাৎ তাদের সঙ্গী-সাথী কারা এ সব ব্যাপারে তারা কোন খবরা খবরই রাখে না। এ ছাড়া তাদেরকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরতও রাখে না।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এসব পিতা-মাতাই তাদের ধন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার প্রবৃদ্ধির জন্য খুবই আগ্রাহান্বিত থাকেন, সদা জাগরুক থাকেন, অথচ এসব সম্পদ সাধারণত তারা অন্যের জন্যই রেখে যান। অথচ সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে তারা মোটেও যত্নবান নন, যার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হলে দুনিয়া ও আখেরাতের সবস্থানেই তারা কল্যান বয়ে আনতে পারে।

অনুরূপভাবে পানীয় ও আহার্যের মাধ্যমে ছেলে মেয়েদের শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য খাদ্য দ্রব্যের যোগান দেওয়া, তাদের শরীরকে কাপড় দিয়ে ঢাকা যেমন পিতার উপর ওয়াজিব তেমনিভাবে পিতার জন্য অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সন্তানের অন্তরকে ইলম ও ঈমানের মাধ্যমে তরতাজা রাখা এবং তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতির লেবাস পরিধান করিয়ে দেওয়া, কেননা তা তাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর।

সন্তানের অধিকারের মধ্যে আর একটি অধিকার এই যে, পিতা মাতা তাদের জন্য সৎভাবে ব্যয় করবেন। তবে এ ব্যাপারে কার্পণ্য ও অমিতব্যয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন না। কারণ, এটা তাদের ওপরে সন্তানের অধিকার ও কর্তব্য। আর আল্লাহ তা'আলা তাকে যে নেয়ামত দান করেছেন, সে ব্যাপারে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। এটা কিছুতেই ঠিক হবে না যে, ধন সম্পদকে পিতা তার জীবদ্দশীয় ছেলে মেয়েদের ওপর ব্যয় না করে তা কুক্ষিগত করে রাখবেন অথচ তারা মৃত্যুর পর সে ছেলে-ময়েরাই তা লুফে নিয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করবে।

অতএব, পিতা যদি ধন সম্পদে আসক্তিবশত সন্তানদের ওপর ব্যয় করার ব্যাপারে কার্পণ্য করেন, তা হলে তাদের জন্য বৈধ হচ্ছে তাদের প্রয়োজনমাফিক সৎভাবে সে মাল থেকে গ্রহণ করা এবং ব্যয় করা। আর এরূপ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিনদা বিনতে ওতবার ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন।

সন্তানের অধিকারের মধ্যে আরেকটি অধিকার এই যে, উপহার-উপঢোকন এবং দানের ক্ষেত্রে তাদের একজনকে অন্যজনের উপরে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে না। অতএব, সন্তানদের কাউকে কিছু দেওয়া এবং কাউকে তা থেকে বঞ্চিত করা অনুচিত। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এটা নিতান্তই জুলুম। আর আল্লাহ কখনো জালেমদের ভালবাসেন না। এইরূপ করা হলে, যারা বঞ্চিত তাদের মধ্যে একটি বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার ভাব উদ্রেক হয় এবং পুরস্কৃত ও বঞ্চিতদের মধ্যে একটি স্থায়ী শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এমনকি অধিকন্তু বঞ্চিত সন্তান-সন্ততি ও তাদের পিতা-মাতার মধ্যে একটি শত্রুতা ও তিক্ততা সৃষ্টি হয়।

আর কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা তাদের উপর কৃত সদ্ব্যবহার ও অনুকম্পার প্রেক্ষিতে তাদের কোনো কোনো সন্তানকে অন্যদের ওপর বিশিষ্টতা দিয়ে থাকে। আর এ কারণেই যদি পিতা-মাতা তাকে দান-অনুদান এবং পারিতোষিক প্রদান করেন, তা হলে সেটা কখনো সঠিক হবে না। অর্থাৎ কারো সদ্ব্যবহার অথবা পূণ্যবান হওয়ার কারণে তার বিনিময়ে কিছু দেয়া জায়েয হবে না। কেননা, নেক কাজের পরিনাম ও ফলাফল আল্লাহর কাছেই রয়েছে। তাছাড়া কোনো সৎস্বভাব বিশিষ্ট সন্তানকে যদি অনুরূপ ভাবে অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে বেশী দান করা হয়, তা হলে সে মনে মনে গর্বিত ও আত্মতুষ্ট না হয়ে পারে না এবং সে সব সময়ই তার একটি (বাড়তি) পজিশন আছে বলে ধরে নেবে, যার ফলে অন্যরা পিতা-মাতাকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করবে এবং তাদের ওপর জুলুম চালিয়ে যেতে থাকবে। অপর দিকে ভবিষ্যত সম্পর্কে আমরা আদৌ কিছু জানি না। এমনওতো হতে পারে যে, এখন যে অবস্থাটা কারো ব্যাপারে বিদ্যমান রয়েছে, তার আমুল পরিবর্তন হতে পারে। আর এ ভাবেই একজন অনুগত ও পুণ্যাত্মা আগামী দিনগুলোতে বিদ্রোহী ও অত্যাচারী হয়ে যেতে

পারে এবং একজন বিদ্রোহীও পুণ্যাত্মায় পরিণত হতে পারে। মানুষের অন্তরের বাগডোরতো আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ-তিনি যেদিকে চান সে দিকেই তা ঘুরাতে সক্ষম।

বোখারী এবং মুসলিম শরীফে আছে : নো'মান বিন বশীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার পিতা বশীর ইবন সা'দ তাকে একটি গোলাম দান করলেন। অতঃপর এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলো। তিনি বললেন: (হে, বশীর) তোমার প্রতিটি ছেলে কি এইরূপ পেয়েছে? তিনি বললেন: না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তা হলে তা ফেরত নাও।'

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে তিনি বলেন: 'আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তান-সন্ততির মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে চেষ্টা কর।"

তাছাড়া এভাবেও বর্ণিত রয়েছে যে তিনি বলেছেন, 'আমি এ ব্যতীত সব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি জুলুমের ব্যাপারে ব্যাপারে সাক্ষ্য হবো না।'

মোটকথা: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তান-সন্ততির মধ্যে কাউকে কারো ওপরে গুরুত্ব দানের বিষয়টিকে জুলুম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আর জুলুম তো হারাম।

কিন্তু সন্তানদের মধ্যে যদি কারো কোনো প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয় এবং অন্যদের তা প্রয়োজন না হয়, যেমন ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনো একটি সন্তানের লেখাপড়ার তথা বিদ্যালয়ের উপকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় অথবা রোগের চিকিৎসা অথবা বিবাহ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, এমতাবস্থায় সে ব্যাপারে খরচ মেটানোর ব্যবস্থা করা আদৌ দোষণীয় নয়। কারণ এটা নিতান্ত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই করা হয়ে থাকে। আর এরূপ ব্যয় মূলত: সন্তান-সন্ততির খোরপোষ তথা লালন-পালনের ব্যয় ভারের মধ্যেই গণ্য হবে।

যখন পিতা তার সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা দান ও তার প্রতি যা কিছু ব্যয় করা দরকার তা করার মাধ্যমে তার উপর ন্যস্ত কর্তব্য পালন করবে, তখন তার সন্তান ও পিতা-মাতার প্রতি মার্জিত আচরণ করবে এবং তার যাবতীয় অধিকারকে সংরক্ষণ করবে। আর পিতা যদি এ ব্যাপারে ত্রুটি করেন তাহলে সন্তানের অবাধ্যতার

শিকার হওয়ার জন্য সে উপযুক্ত হবেই। কেননা, এই অবস্থায় সন্তান তার পিতার অধিকার অস্বীকার করবে এবং তার অবাধ্য আচরনের দ্বারা পিতাকে অনুরূপ শাস্তি প্রদান করবে। কাজেই যেমন কর্ম তেমন ফল।

পাঁচ : আত্মীয় স্বজনের অধিকার

সে সব নিকটতম ব্যক্তি যারা আমাদের সাথে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ যথা ভাই-বোন, চাচা-মামা এবং তাদের ছেলে মেয়ে এবং তাদের ছাড়াও অন্য লোক যারা আত্মীয়তা সূত্রে আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট আমাদের উপর নিকটতম অনুসারে তাদের প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ﴾ [الاسراء: ٢٦]

'এবং নিকট আত্মীয়ের অধিকার আদায় কর।' [সূরা বনী ইসরাইল: ২৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿ ۞وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ﴾ [النساء: ٣٦]

'আর আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না, এ ছাড়া মাতা-পিতার সাথেও উত্তম আচরণ কর, আর উত্তম আচরণ কর নিকটাত্মীয়ের সাথে।' [সূরা আন-নিসা: ৩৬]

সুতরাং প্রত্যেক লোকেরই উচিত, সে যেন তার নিকটাত্মীয়ের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। এ উত্তম আচরণ বিভিন্ন পন্থায় হতে পারে। অর্থাৎ আত্মীয়ের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ধন-সম্পদের মাধ্যমে এবং শারীরিক শক্তি সামর্থের দ্বারা তথা যে কোনো উত্তম পন্থায়। মানুষের বুদ্ধি বৃত্তি, প্রকৃতি এবং শরীয়াতের দাবীও এটাই!

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন এবং হাদিসেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশেষ করে নিকটাত্মীয়ের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে লোকদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা সমগ্র সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করে যখন নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন ‘বংশসম্পর্ক’ দাড়িয়ে বলল : আপনার নিকট সম্পর্কচ্ছেদ হতে রক্ষা প্রার্থীর এটাই উত্তম স্থান। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বললেন : ‘তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, যে ব্যক্তি তোমারাসথে সম্পর্ক রক্ষা করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করব, আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে আমিও

তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করব। অতঃপর সে বলল, অবশ্যই-হ্যাঁ, তিনি বললেন, তবে তাই হোক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা (আমার কথার সমর্থনে) ইচ্ছা হলে পড়তে পার, (আল্লাহ তা‘আলার বাণী)

﴿ فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرۡحَامَكُمۡ ٢٢ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمۡ وَأَعۡمَىٰٓ أَبۡصَٰرَهُمۡ ٢٣ ﴾ [محمد: ٢٢، ٢٣]

‘তোমরা শীঘ্রই এ থেকে ফিরে যাবে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আর যারা এরূপ করবে তাদের ওপরই আল্লাহর অভিশম্পাত বর্ষিত হবে। আর এ ধরণের লোকদেরকেই বধির এবং অন্ধ করে দেওয়া হবে।’ [সূরা মুহাম্মাদ: ২২-২৩]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলে।’ [বুখারী, ৬১৩৮]

অধিকাংশ লোকই এই অধিকারটিকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে এবং এর প্রতি বিশেষ অবহেলা প্রদর্শন করছে। এদের মধ্যে এমন লোকের

দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যে তার আত্মীয় স্বজনের কোনো পরিচয়ই রাখে না। এমনকি কোনো প্রকার সম্পদ ব্যয় করে অথবা ব্যক্তিগত সদ্ভাব রক্ষা করে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে না। এ ধরণের লোকও আোমাদের সমাজে বিরল নয় যে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অনেকে আত্মীয় স্বজনের খবর নেয় না, তাদের সাথে দেখা সাক্ষাতের কোন ধার ধারে না। না সুখে সম্পদে তাদের নিকট কোনো উপঢোকন প্রেরণ করে আর না তাদের দুঃখের দিনে অথবা নিতান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের পাশে এসে দাড়ায়। বরং অধিকাংশ সময় তারা আত্মীয় স্বজনকে কথা অথবা কাজে দুঃখ দিয়ে থাকে, এমনকি কখনও কখনও এই উভয়বিধ উপায়েই দুঃখ দিয়ে থাকে।

আবার কোনো কোনো লোক এমনও রয়েছে যে দূরের লোকের সাথে সম্পর্ক রাখে অথচ তার নিকটাত্মীয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। আবার কেউ আছে যে আত্মীয় স্বজনের সাথে ঠিক তখনই সম্পর্ক রাখে যখন তারা তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে, আর যখন তারা সম্পর্ক রাখে না তখন ও তারাও সম্পর্ক ঠিক রাখে

না। এটাকে প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বলা যেতে পারে না। এটাকে নেহায়েত ভালো কাজের অনুরূপ অর্থাৎ বিনিময়ে আরেকটি ভালো কাজ বলা যায় মাত্র- যা নিকটাত্মীয় বা অন্যদের ব্যাপারে করা হয়ে থাকে। আর কোনো কাজের পুরস্কার শুধু নিকটাত্মীয়দের বেলা সীমাবদ্ধ নেই। তাকেই আমরা প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী বলতে পারি যে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলে এবং এর বিপরীত হলে সে ব্যাপারে সে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না, চাই তার আত্মীয়-স্বজন তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে অথবা না চলে। এই প্রসংগে বোখারী শরীফে আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন ‘আস রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

«لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا»

‘তাকে প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী বলা যেতে পারে না, যে শুধু ততটুকুই করে যতটুকু তার আত্মীয় তার সাথে করে থাকে। বরং প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী তাকেই বলা যেতে পারে, যে ব্যক্তি তার আত্মীয় তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সে তা রক্ষা করে চলে।’ [বুখারী, ৫৯৯১]

তাছাড়া এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বলে প্রশ্ন করল: হে, আল্লাহর রাসূল ! আমার কতিপয় আত্মীয় আছে। আমি তাদেরা সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলি অথচ তারা আমার সাথে তা ছিন্ন করে, আর আমি তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা সত্ত্বেও তারা আমার সাথে মন্দ আচরণ করে থাকে। আমি তাদের ব্যাপারে সহিষ্ণুতার পরিচয় দেই অথচ তারা তার উল্টো করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'তোমার অবস্থা যদি এরূপই হয় যা তুমি বললে, তা হলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করলে। আর তাদের বিপক্ষে তুমি সব সময়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী পাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ঐ অবস্থায় বহাল থাকবে- [মুসলিম: ২৫৫৮]।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার কারণে শুধুই এটাই লাভ হতো যে, আল্লাহ তার সে সম্পকর্কে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কায়েম রাখেন, তার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকবে এবং তার যাবতীয় কাজ সহজতর করে দেওয়া হবে এবং তার যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট দুর হয়ে যাবে (তবে তা-ই যথেষ্ট ছিল)। অথচ এর অন্য

লাভ তো রয়েছেই, ‘তাদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং সুখে-দুঃখ পরস্পরের প্রতি সাহায্য। সহযোগিতার কারণে তাদের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। আর যখন এর বিপরীত তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়, তখন এইসব কল্যাণও দূরীভূত হয়ে যায়।

ছয় : স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

মানুষের বৈবাহিক জীবনের কতেক ফলাফল এবং প্রয়োজনীয় চাহিদা রয়েছে। আর বিয়ে হচ্ছে এমন একটি সম্পর্ক যা স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই পারস্পরিক অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই অধিকারগুলো হচ্ছে শারীরিক অধিকার, সামাজিক অধিকার, এবং অর্থনৈতিক অধিকার।

এ কারণেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ের এটা অবশ্য কর্তব্য যে, তারা সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করবে এবং কোনো প্রকার মানসিক অসন্তুষ্টি ও দ্বিধা বাতিরেকেই তাদের যা কিছু আছে একে অন্যের জন্য অকাতরে ব্যয় করবে! আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [النساء: ١٩]

‘আর তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে উত্তম ব্যবহার কর।’ [সূরা আন-নিসা: ১৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন :

﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

‘আর স্ত্রীদের যা কিছু পাওনা রয়েছে তা উত্তম আচরণের মাধ্যমে পৌঁছে দাও। আর তাদের উপর পুরুষদের একটি উঁচু মর্যাদা রয়েছে।’ [সূরা আল-বাকারাহ: ২২৮]

স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর যেরূপ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা কর্তব্য, তেমনিভাবে স্ত্রীরও এটা কর্তব্য যে সে যেন তার স্বামীর জন্য তার সাধ্যানুসারে যা প্রদান করার তা প্রদান করে। আর এভাবেই যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ই তাদের পারস্পরিক কর্তব্যগুলো আদায় করার জন্য প্রস্তুত হবে, তখনই তাদের উভয়ের জীবন হবে অতীব সুখময় এবং তাদের সম্পর্ক হবে চিরস্থায়ী। আর যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও বিচ্ছেদ দেখা দেবে বৈকি। ফলে তাদের জীবন হয়ে পড়বে পুঁতিগন্ধময়।

স্ত্রীলোকদের সঠিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের প্রতি উত্তম ব্যবহার ও উপদেশ দানের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য বাণী উদ্ধৃত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ»

'স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে তোমরা কল্যাণের উপদেশ গ্রহণ কর। কেননা তাদেরকে তৈরীই করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে, আর পাজরের যা সবচেয়ে বক্র তা উপরের অংশে থাকে। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও তবে তা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি এমনি ছেড়ে দাও তবে তা চিরদিন বক্রই থেকে যাবে। অতএব, তাদের ব্যাপারে কল্যাণের অসিয়ত গ্রহণ কর[4]।'

অন্য একটি বর্ণনায় আছে-

«إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا، كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا»

'মেয়েলোককে পাঁজরের হাড় থেকে তৈরী করা হয়েছে। তুমি কোনো অবস্থায়ই সোজাপথে দৃঢ় পাবে না। তার কাছ থেকে

[4] বুখারী, ৩৩৩১; মুসলিম, ১৪৬৮।

ফায়দা গ্রহণ করতে চাইলে তা গ্রহণ কর, কিন্তু তার মধ্যে বক্রতা থাকবেই । তুমি যদি তা সোজা করতে চাও, তবে তা ভেঙ্গে যাবে, আর ভেঙ্গে যাবার শেষ পরিণতি হচ্ছে বিচ্ছেদ বা তালাক[5]।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»

'কোন মুমিন পুরুষ যেন কেন মমিন স্ত্রীকে তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা না করে। তার আচার আচরনের কোনো একটি অপছন্দনীয় হলেও অন্যটি সন্তোষজনক হতে পারে[6]।'

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব হাদীসে পুরুষ লোকেরা তাদের স্ত্রীদের সাথে কি ধরনের আচরন করবে সে ব্যাপারে তার উম্মাতের প্রতি দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন। তিনি এটাই জানাচ্ছেন যে, পুরুষদের কর্তব্য হচ্ছে এই যে, সহজ উপায়ে তাদের নিকট থেকে যতটুকু সুব্যবহার পাওয়া সম্ভব, তারা যেন তাই গ্রহণ করে। কারণ, সৃষ্টিগত কারণেই তাদের প্রকৃতির মধ্যে

---

[5] মুসলিম, ১৪৬৮।

[6] মুসলিম, ১৪৬৯।

পুরুষদের চেয়ে কিছুটা অসম্পূর্ণতা রয়েছে, পূর্ণভাবে কোনো কিছু তাদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে একটি বক্রতা রয়েছে। অতএব, যাদেরকে যে প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে অস্বীকার করে তাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার কল্যাণ বা ফায়দা লাভ করা সম্ভব নয়।

তাছাড়া এসব হাদীসে আরও এসেছে যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীলোকদের মধ্যকার ভালো ও মন্দ স্বাভাবগুলো তুলনা করে দেখা। এটা এজন্য যে, যদি কোনো পুরুষ তার কোনো আচরণে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয় তাহলে এমন একটি স্বভাবের সাথে তা তুলনা করে দেখা প্রয়োজন যা দ্বারা সে সন্তুষ্ট হতে পারে। তার প্রতি শুধু ঘৃণা ও রাগস্বরে তাকাবে না।

আর অনেক পুরুষ এমন রয়েছে যারা তাদের স্ত্রীদের মধ্যে পরিপূর্ণ অবস্থা প্রত্যাশা করে অথচ বস্তুত:ই এটা সম্ভব নয়। আর এ কারণেই একটি তিক্ততা সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে ! আর সে জন্যই তাদের স্ত্রীদের দ্বারা তারা কোনো প্রকার উপকৃত হতে পারে না। বরং অধিকন্তু এই তিক্ততা সৃষ্টিতাপূর্ণ অবস্থা তাদেরকে বিচ্ছেদের দিকে ধাবিত করে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'তুমি যদি তাকে সোজা করতে চাও তা হলে ভেঙ্গে ফেলবে- আর এর চুড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে তালাক।' এমতাবস্থায় পুরুষের কর্তব্য হচ্ছে দ্বীন এবং শরীয়তের পরিপন্থী নয় এমন কিছু কাজ যা স্ত্রী করে সে ব্যাপারে সে যেন সহজভাবে গ্রহণ করে এবং দেখেও না দেখার অবস্থায় থাকা।

স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার এই যে, স্বামী তার খাবার, পোশাক পরিচ্ছদ, বাসস্থান এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সরবরাহ করবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে বলেছেন :

﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: ٢٣٣]

'স্ত্রীলোকদের খোর-পোষ এবং পরিধেয় বস্ত্র উত্তমভাবে সরবরাহ করা তাদের ওপর অবশ্য কর্তব্য।' [সূরা আল-বাকারাহ: ২৩৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»

'তোমাদের (পুরুষদের) ওপর কর্তব্য হচ্ছে তাদের খাদ্য-সামগ্রী এবং বস্ত্রাদি প্রদান করা।' [মুসলিম, ১২১৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই মর্মে প্রশ্ন করা হলো যে, আমাদের কারো স্ত্রী থাকলে তার ওপর স্ত্রীর কি অধিকার রয়েছে। তিনি বললেন :

«أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»

'তুমি খেয়ে থাকলে তাকেও খাওয়াবে, তুমি পরিধান করল তাকেও পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করবে, আর তার মুখমণ্ডলে কখনো আঘাত করবে না এবং তাকে গালিও দিবে না এবং তাকে ঘর ছাড়া অন্য কোথাও ত্যাগ করবে না'[7]। (আবু দাউদ)।

স্ত্রীর অধিকারের মধ্যে আরেকটি অধিকার হচ্ছে এই যে, স্বামীর যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে তাদের মধ্যে সে ইনসাফ কায়েম করবে। ইনসাফ কায়েম করতে হবে তাকে তাদের খাদ্য-সামগ্রী, বাসস্থান এবং সহঅবস্থানের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ সার্বিক ব্যাপারেই তাদের সাথে সম্ভাব্য আদল রক্ষা করতে হবে। তাদের একজনের দিকে অত্যাধিক ঝুঁকে পড়া বড় বড় গুণাহসমূহের মধ্যে একটি।

---

[7] আবু দাউদ, ২১৪২।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ»

'যদি কারো দু'জন স্ত্রী থাকে এবং তার একজনের দিকে যদি সে বেশী ঝুকে পড়ে তাহলে সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপনীত হবে যে, তার শরীরের একাংশ অনুরূপ ঝুঁকে থাকবে[8]।'

কিন্তু প্রেম ও ভালোবাসা এবং অন্তরের প্রশান্তি ইত্যাদির ব্যাপারে মানুষের কোনো হাত থাকে না। কারণ এগুলো একান্তই মানসিক ব্যাপার। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে যদি আদল সম্ভব না হয় এবং কিছুটা তারতম্য ঘটে তা হলে তাতে কোনো পাপ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ ﴾ [النساء: ١٢٩]

'তোমাদের ইচ্ছা থাকলেও (একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে) তোমরা আদল রক্ষা করতে সক্ষম হবে না।' [সূরা আন-নিসা: ১২৯]

---

[8] আবু দাউদ, ২১৩৩।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবিদের ক্ষেত্রে (সময়) বণ্টন করে নিতেন এবং আদল রক্ষা করতেন। তিনি এ ব্যাপারে এই বলে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন:

«اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي، فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي، فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ»

‘হে আল্লাহ ! যে ব্যাপারে আমার কর্তৃত্ব ও মালিকানা রয়েছে সে ব্যাপারে আমার বন্টন ব্যবস্থা এই। আর যে ব্যাপারে আমার কোনো মালিকানা বা কর্তৃত্ব নেই বরং তুমিই তার মালিক সে ব্যাপারে আমাকে ভৎর্সনা করো না[9]।’

কিন্তু দু’জন স্ত্রীর ক্ষেত্রে এক জনের সম্মতিক্রমে যদি দ্বিতীয় জনের সাথে অবস্থানের অনুমতি নেওয়া হয়, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, তিনি আয়েশার জন্য তার (প্রাপ্য) দিনটি এবং সাওদা কর্তৃক আয়েশার জন্য প্রদত্ত দিনটিও আয়েশার জন্য বণ্টন করে দিয়েছেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায়ও জিজ্ঞেস করছিলেন,

---

[9] আবু দাউদ, ২১৩৪।

«أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟»

'আমি আগামীকাল কোথায় থাকব? আমি আগামীকাল কোথায় থাকবো?'

অতঃপর তাঁর স্ত্রীগণ তাঁকে এই মর্মে অনুমতি দিলেন যে তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানেই থাকতে পারেন। অতঃপর তিনি আয়েশার গৃহেই অবস্থান করেন এবং সেখানেই মারা যান।

স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার স্ত্রীর অধিকারের চেয়েও বড়। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

'তাদের ওপর যে রূপ সদাচার প্রয়োজন, তাদের জন্যও অনুরূপ প্রয়োজন এবং তাদের ওপর পুরুষদের একটি মর্যাদা রয়েছে।' [সূরা আল-বাকারাহ: ২২৮]

পুরুষই হচ্ছে স্ত্রীর পরিচালক। কারণ পুরুষ লোক স্ত্রী লোকের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ, শিষ্টাচার শিক্ষাদান এবং দেখা-শোনার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ﴾ [النساء: ٣٤]

'পুরুষগণ মহিলাদের অভিভাবক এবং দায়িত্বশীল। এটা এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের একের ওপর অন্যদের বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ তাদের সম্পদ থেকে তাদের স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করে থাকে।' [সূরা আন-নিসা: ৩৪]

স্ত্রীর ওপর পুরুষের অধিকারের মধ্যে আরও রয়েছে, আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যতিরেকে সর্বক্ষেত্রে সে তার স্বামীর আনুগত্য করবে এবং তার ধন-সম্পদ ও তার গোপনীয়তার সংরক্ষণ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»

'যদি আমি কোনো মানুষ অপর কারও জন্য সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তবে মহিলাকে তার স্বামীকে সিজদা করতে নির্দেশ দিতাম'[10]।

---

[10] তিরমিযী, ১১৫৯।

অন্য হাদীসে এসেছে,

«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»

'যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সাথে শয্যাশায়ী হতে আহ্বান জানায় এবং যদি উক্ত স্ত্রী তা অস্বীকার করে এবং স্বামী তার ওপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তার ওপর অভিশম্পাত বর্ষণ করেন'[11]।

স্ত্রীর ওপর স্বামীর আরেকটি অধিকার এই যে, স্বামীর কোনো বৈধ স্বার্থে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো কাজ স্ত্রী করবে না, চাই তা কোনো (নফল) ইবাদতের মাধ্যমেই হোক না কেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

---

[11] বুখারী, ৩২৩৭।

স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্ত্রীর রোজা (নফল) রাখাও জায়েয হবে না এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতিত তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়াও স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়[12]।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতে প্রবেশের উপায়সমূহের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্তোষকে একটি অন্যতম উপায় বলে গণ্য করেছেন। উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّةَ»

'যদি কোনো স্ত্রী এমতাবস্থায় মারা যায় যে তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট, তা হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' [তিরমিযী, ১১৬১]

[12] বুখারী, ৫১৯৫।

সাত : শাসক ও শাসিতের অধিকার

শাসক তো তারাই, যারা মুসলিম জনগণের যাবতীয় কাজের দায়িত্বশীল বা জিম্মাদার। যেমন সাধারণভাবে রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থায় প্রধান ব্যক্তি অথবা বিশেষ করে কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কোনো ব্যক্তি। এ উভয়ই মুসলিমদের অভিভাবক বলে বিবেচিত। দেশের নাগরিক বা প্রজা সাধারণের ওপর এদের যেমন অধিকার রয়েছে, তাদের ওপরও প্রজা সাধারণের অধিকার রয়েছে।

শাসক বা রাষ্ট্র পরিচালকদের ওপর প্রজা সাধারণের অধিকার এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে আমানত লাভ করেছেন এবং জিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন সে মোতাবেক তারা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। আর সেটা করতে হবে মুমিনদের পথ অনুসরণের মাধ্যমেই। সে পথের মানেই হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্মপদ্ধতি। কারণ, এ পথেই তাদের, তাদের প্রজাবর্গ ও যারা তাদের অধিনস্থ রয়েছে তাদের জন্য সৌভাগ্য রয়েছে। প্রজাদের থেকে শাসকদের

জন্য সন্তুষ্টি লাভের এটাই সবোত্তম মাধ্যম, এর মাধ্যমেই তাদের মধ্যকার সম্পর্ক মজবুত হয়, তারা তাদের শাসকদের নির্দেশের প্রতি আনুগত্য করে, যে আমানত তারা তাদের প্রতি ন্যস্ত করেছে সেটা সংরক্ষণে তৎপর থাকে। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তাকে লোকেরাও ভয় করে চলে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখে আল্লাহ মানুষের ব্যাপারে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং জনগণের মাধ্যমে আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট রাখেন। কারণ, সমস্ত মানুষের অন্তরতো আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ তিনি যে দিকে চান, সে দিকেই তা প্রত্যাবর্তন করেন।

আর মুসলিমদের জিম্মাদার তথা শাসকের অধিকার হচ্ছে এই যে, জনগণের পক্ষ থেকে তারা যে ব্যাপারে দায়িত্বশীল সে ব্যাপারে তাদের কল্যাণ কামনা করা প্রজাদের কর্তব্য। তারা কোনো ব্যাপারে গাফেল বা অন্যমনস্ক হয়ে গেলে সে ব্যাপারে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়াও প্রজা সাধারনের কর্তব্য। তারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হলে তখন তাদের জন্য দোয়া করতে হবে। আর আল্লাহর আনুগত্যের খেলাফ নয় তাদের এমন সব কাজে সহযোগিতা ও সমর্থন করা প্রজাদের কর্তব্য। কেননা এরূপ

সহযোগিতার মাধ্যমেই তারা তাদের ওপর ন্যাস্ত দায়িত্ব সঠিক এবং সুশৃংখলভাবে আঞ্জাম দিতে পারেন। এর বিপরীত যদি তাদের শুধু বিরুদ্ধাচরণ ও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই করা হয়, তা হলে সমাজে বিশৃংখলা দেখা দিবে বৈকি। আর এজন্যই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যসহ সামাজিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গেরও আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ [النساء: ٥٩]

‘হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহর আনুগত্য করো, আরও আনুগত্য করো আল্লাহর রাসূলের। আর আনুগত্য কর সেসব লোকের যারা তোমাদের ব্যাপারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত।’ [সূরা আন-নিসা: ৫৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»

‘একজন মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত তার নেতা তাকে কোনো প্রকার পাপের কাজে আদেশ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কথা শোনা এবং তার আনুগত্য করা- চাই তা তার কাছে ভালো লাগে কি ভালো না লাগে। তবে যখন সে কোনো অন্যায় কাজে আদেশ করবে তখন তার কথা শোনা এবং তার প্রতি আনুগত্য দেখানো যাবে না’[13]। - (বুখারী ও মুসলিম)।’

‘আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন:

«كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ... إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى

[13] মুসলিম, ১৮৩৯।

النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ»

‘আমরা একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সফরে ছিলাম। অতঃপর আমরা একটি স্থানে উপনীত হলাম। তারপর একজন নামাজের জন্য আমাদের আহ্বান জানালো। আর আমরাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গিয়ে হাজির হলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আল্লাহ্ যাকেই এ পৃথিবীতে নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, তাকে এ দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, তিনি তার উম্মাতকে ভালো কাজের নির্দেশ দিবেন এবং যা কিছু অকল্যাণকর সে ব্যাপারে তাদের ভীতি প্রদর্শণ করবেন। আর তোমাদের এই যে উম্মাত তার প্রথমাংশের জন্য যা কিছু মঙ্গলকর তা তারা লাভ করেছেন। আর তার শেষ অংশের জন্য এমন সব বালা-মুসিবত তথা অমঙ্গল আসতে থাকবে যার সাথে তোমরা কখনও পরিচিত নও। আবার কিছু বিপর্যয় ও ফেতনা আসবে, যা মানুষকে একে অপরের উপর প্রলুব্ধ করবে। আবার কিছু ফেতনা বা পরীক্ষা আসবে, তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে, এটাতেই তো

আমার ধ্বংস রয়েছে। তারপর তা কেটে যাবে। তারপর আবার কিছু ফিতনা বা পরীক্ষা আসবে, তখন মুমিন বলতে থাকবে, এটা এটা। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, তার মৃত্যু যেন এ অবস্থায় আসে যে, সে আল্লাহ এবং আখেরাতের ওপর ঈমানদার। আর সে এমন ব্যক্তির কাছে এমনভাবে আসবে যেভাবে আসা সে লোকটি পছন্দ করে। আর কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ইমামের হাতে বাই‘আত তথা আনুগত্যের শপথ করে এবং অন্তর দিয়েই তাকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে, তখন সে যেন তার সাধ্যানুসারে তার আনুগত্য করে। এর পর যদি অন্য কেউ তার সে ইমামের বিরুদ্ধে ঝগড়া করতে আসে তখন তোমাদের কর্তব্য হলো তার গর্দানে আঘাত করা (মুসলিম)[14]।’

তাছাড়া কোনো এক ব্যক্তি এই বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন-করল :

[14] মুসলিম, ১৮৪৪।

يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ»

'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য যখন নেতা মনোনীত হয় তখন তারা চায় যে আমরা যেন তাদের অধিকারগুলো আদায় করি। অথচ তারা আমাদের অধিকারগুলো আদায় করতে নারাজ। এই ব্যাপারে আপনার কি অভিমত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাপারে নিরুত্তর রইলেন অর্থাৎ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উক্ত লোকটি এরপর তাকে আবারও প্রশ্ন করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাদের কথা শোন এবং তাদের আনগত্য কর। তারা যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তার জবাবদিহী তারাই করবে আর তোমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তার দায়দায়িত্ব তোমাদের ওপরই বর্তাবে।' [মুসলিম, ১৮৪৬]

জনসাধারণের ওপর শাসকবর্গের অধিকার এই যে, তারা যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাস্তবায়নের ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা

চাইবে তাতে সহযোগিতা করবে। এছাড়া তাদের প্রত্যেককেই কাজের নিজ নিজ গণ্ডি ও পরিসীমা এবং সামগ্রিক ভাবে সমাজে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকবে। যাতে করে সকল কাজ তার স্বাভাবিক গতিতে চলে। কেননা, শাসকবর্গকে যদি প্রজাগণ তাদের সাধারণ প্রয়োজনীয় কাজে সহযোগিতা না করে তা হলে তা পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না।

আট : প্রতিবেশীর অধিকার

তোমার বাসস্থানের নিকটতম ব্যক্তিই তোমার প্রতিবেশী। তোমার ওপর তার অনেক অধিকার রয়েছে। যদি সে তোমার রক্ত সম্বন্ধের দিক দিয়ে কাছাকাছি লোক হয় এবং মুসলিম হয় তা হলে তোমার ওপর তার তিনটি অধিকার রয়েছে। আর সে তিনটি অধিকার হচ্ছে- প্রতিবেশীর অধিকার, নিকট আত্মীয়ের অধিকার এবং ইসলামের অধিকার। আর যদি সে শুধু মুসলিম হয় এবং বংশ সুত্রে কোন নিকট আত্মীয় না হয় তা হলে তার জন্য দু'টি অধিকার রয়েছে- প্রতিবেশী হিসেবে অধিকার এবং মুসলিম হিসেবে অধিকার। আর এমনিভাবেই যদি সে নিকটতম ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয় এবং মুসলিম না হয় তা হলেও তার দু'টি অধিকার রয়েছে একটি হচ্ছে প্রতিবেশীর অধিকার এবং অন্যটি হচ্ছে আত্মীয়তার অধিকার। আ যদি সে কোন আত্মীয় না হয় অর্থাৎ অনাত্মীয় এবং মুসলিমও নয় তা হলে তার জন্য একটি অধিকার রয়েছে- আর তা হচ্ছে প্রতিবেশীর অধিকার। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ﴾ [النساء: ٣٦]

'পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, আর সদ্ব্যবহার কর নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম-মিসকিন, নিকটতম প্রতিবেশী ও দূরের প্রতিবেশীর সাথে।' [সূরা আন-নিসা: ৩৬]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ»

'জিবরাইল সব সময় আমাকে প্রতিবেশী সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে আসছেন, যার ফলে আমার এ ধারণা হলো যে, হয়তো শীঘ্রই তাকে উত্তরাধিকারী রূপেও গণ্য করা হবে[15]। (বুখারী ও মুসলিম)।'

একজন প্রতিবেশীর ওপর তার অপর প্রতিবেশীর অধিকার হচ্ছে এই যে, উক্ত প্রতিবেশী যেন তার সাধ্যানুসারে তার ধন-সম্পদ

[15] বুখারী, ৬০১৫; মুসলিম, ২৬২৫।

এবং মর্যাদা ও কল্যাণকারিতার মাধ্যমে তার সাথে সদ্ব্যবহার করে। ‘রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«خَيْرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ»

‘আল্লাহর নিকট সে সব প্রতিবেশীই উত্তম বলে বিবেচিত যারা তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম বলে গণ্য[16]।’

তিনি আরো বলেছেন :

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ »

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতের ওপর বিশ্বাসী সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে[17]।’

তিনি আরো বলেছেন :

«إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ»

---

[16] তিরমিযী, ১৯৪৪।

[17] মুসলিম, ৪৮।

‘তুমি যখন তরকারী রান্না কর, তখন তাতে বেশী করে পানি দাও (ঝোল বাড়িয়ে দাও) এবং তোমার প্রতিবেশীর মধ্যে তা হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ কর[18]।’

এছাড়া প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের আরেকটি দিক হচ্ছে এই যে, তার সাথে সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার জন্য বেশী বেশী করে উপহার উপঢৌকন প্রদান করবে। কেননা উপহার উপঢৌকন দ্বারা একদিকে যেমন বন্ধুত্ব গাঢ় হয়, অন্যদিকে শত্রুতাও নিরসন হয়ে যায়।

একজন প্রতিবেশীর ওপর আরেকজন প্রতিবেশীর অধিকার এই যে, তাকে কথা ও কাজে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া থেকে সে নিজেকে বিরত রাখবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ» قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

---

[18] মুসলিম, ২৬২৫।

‘আল্লাহ্‌র কসম ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহ্‌র কসম সে ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহ্‌র কসম সে ব্যক্তি মুমিন নয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, কে সে ব্যক্তি হে আল্লাহর রাসূল ! তিনি বললেন : যার অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী মুক্ত নয়[19]।’

অন্য একটি বর্ণনায় আছে,

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

‘যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে মাহফুজ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না[20]।’

অতএব, যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর কুকর্ম ও অন্যায় আচরণ থেকে মুক্ত নয় সে প্রতিবেশী মুমিন হতে পারে না। অতএব সে জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না।

(অনুতাপের বিষয় যে) বর্তমানে অনেক লোকই প্রতিবেশীর অধিকারগুলোকে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যত্নবান নয়, এমনকি তাদের

---

[19] বুখারী, ৬০১৬; মুসলিম, ৪৬।

[20] মুসলিম, ৪৬।

প্রতিবেশীগণ তাদের অন্যায় আচরণের কারণে শান্তিতে বসবাসও করতে পারছে না। অতএব, তুমি দেখতে পাবে যে, তারা সব সময়ই ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত রয়েছে এবং প্রতিবেশীকে কথা ও কাজে ব্যথা দিচ্ছে। আর এরূপ আচরণ নিসন্দেহে আল্লাহ এবং তার রাসূলের হুকুমের পরিপন্থী, আর মুসলিমদের মধ্যে বিচ্ছেদ, তাদের অন্তরের দূরত্ব এবং একে অন্যের সম্মান বিনষ্ট করণের জন্য এতটাই হচ্ছে বড় কারণ।

নয়: সাধারণ মুসলিমদের অধিকার

এই অধিকারসমূহ অসংখ্য। তার মধ্যে এমন কিছু অধিকার রয়েছে যা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»

'একজন মুসলিমের ওপর অন্য একজন মুসলিমের ৬টি অধিকার রয়েছে। যখন সে তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাকে সালাম করবে। যখন সে তাকে দাওয়াত দেবে, তখন সে তার দাওয়াতে সাড়া দেবে। যখন সে তার নিকট উপদেশ চাইবে, তখন তাকে উপদেশ দান করবে, যখন সে হাঁচি দিবে তখন সে 'ইয়ারহামু কাল্লাহ' বলবে, যখন সে রোগাক্রান্ত হবে তখন তাকে দেখতে

যাবে, আর যখন সে মৃত্যুবরণ করবে তখন তাকে দাফন করতে এগিয়ে যাবে[21]।'

আলোচ্য হাদীসে মুসলিমদের মধ্যকার পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এর মধ্যে প্রথম অধিকারটি হলো: সালাম বিনিময়। সালাম হচ্ছে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এছাড়া মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব সৃষ্টিরও একটি কারণ হচ্ছে সালাম; যা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী থেকেও স্পষ্ট, যেখানে তিনি বলেছেন,

«لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»

'আল্লাহ্‌র কসম ! তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা এবং পরস্পর পরস্পরকে ভালো না বাসা পর্যন্ত মুমিনও হতে পারবে না। আমি কি লোকদিগকে এমন একটি

[21] মুসলিম, ২১৬২।

কাজ সম্পর্কে খবর দিব না যে কাজটি করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা জাগ্রত হতে পারে। আর সেই কাজটি হচ্ছে তোমাদের পরস্পরের মধে সালাম বিনিময়[22]।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো যখনই কারো সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনিই তাকে প্রথমে সালাম করতেন। এমনকি ছেলে-মেয়েদের নিকট দিয়ে যাবার সময়ও তিনি তাদেরকে সালাম করতেন। তবে সুন্নাত হচ্ছে যে, ছোট বড়কে সালাম করবে এবং কম সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম করবে এবং আরোহী ব্যক্তি পায়দলে চলাচলকারীকে সালাম করবে।

কিন্তু যখন এ সুন্নাতের অনুসরণ করা না হয় যা উত্তম পন্থা, তাহলে দ্বিতীয় পন্থাই অবলম্বন করা প্রয়োজন। সুতরাং যদি ছোট সালাম না দেয়; তা হলে বড়রা সালাম দেবে এবং অল্প সংখ্যক লোক যদি সালাম না দেয় তাহলে বেশী সংখ্যক লোকই সালাম দিবে যাতে সালাম নষ্ট না হয়।

---

[22] মুসলিম, ৫৪।

‘আম্মার ইবন ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন :

"ثَلاَثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الإِيمَانَ: الإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَذْلُ السَّلاَمِ لِلْعَالَمِ، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ"

‘যার মধ্যে এই তিনটি গুণ পাওয়া যাবে তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করেছে। তিনটি গুণ হলো এই নিজের থেকেই ইনসাফ করা, সালাম প্রদান করা এবং দারিদ্র সত্ত্বেও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা[23]।’

সালাম দেওয়া যদিও সুন্নাত কিন্তু সালামের জবাব প্রদান করা ফরযে কেফায়া। যদি কেউ দলের পক্ষ থেকে সালাম দেয়, তবে তা অন্যদের থেকে যথেষ্ট হয়ে যায়। আবার কোনো ব্যক্তি যদি একদল লোকের ওপর সালাম করে এবং তাদের একজন তার জবাব দেয়, তা হলে সকলের পক্ষ থেকেই তা আদায় হয়ে যায়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآۗ ﴾ [النساء: ٨٦]

---

[23] বুখারী। তা‘লীক করে। ১/১৫।

‘যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হবে, তখন তোমরাও তাদেরকে উত্তমরূপে অভিবাদন কর অথবা তাদের অভিবাদনের জবাবা দাও।’ [সূরা আন-নিসা: ৮৬]

সালামের জবাবে শুধু আহলান সাহলান (শুভাগমন, ওয়েলকাম) এই কথা বলাই যথেষ্ট নয়। কেননা তাতো সালামের চেয়ে উত্তম কিছু নয়, আর না সালামের অনুরূপ। অতএব যখন বলা হবে ‘আসসালামু আলাইকুম’ তখন তার উত্তরে ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম’ বলা প্রয়োজন, আর যখন শুভাগমন তথা আহলান সাহলান বলা হবে, তখন তাঁর জবাবে অনুরূপ শুভাগমন বলাই শ্রেয়। আর যদি তার সাথে সালাম বা সম্ভাষণ যোগ করা হয়, তা হলে তাই উত্তম।

দ্বিতীয় অধিকার : যখন তোমাকে নিমন্ত্রণ করা হবে, তখন তুমি অবশ্যই তার সে নিমন্ত্রণে সাড়া দেবে। অর্থাৎ যখন তোমাকে কারো বাড়ীতে যাবার জন্য অথবা অন্য কোনো কারণে দাওয়াত করা হবে তখন তুমি তার ডাকে অবশ্যই সাড়া দিবে। দাওয়াতে সাড়া দেওয়া সুন্নাতে মোয়াক্কাদা। কেননা, এর মধ্যে নিমন্ত্রণকারীর অন্তরে ভালোবাসা ও অন্তরের টান রয়েছে। কিন্তু

বিয়ের অলিমার দাওয়াত এর থেকে স্বতন্ত্র। কারণ, অলিমার দাওয়াতে সাড়া দেওয়া কিছু শর্তানুসারে ওয়াজিব। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ»

‘আর যে কেউ অলিমার দাওয়াতে সাড়া না দিবে, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা অবলম্বন করল’[24]।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, “যখন তোমাকে ডাকবে তখন তুমি তার ডাকে সাড়া দিবে” এর মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত হবে, সাহায্য-সহযোগিতার জন্য ডাকলে তাতে সাড়া দেওয়া, কোনো বোঝা উঠিয়ে দিতে ডাকলে, বা কোনো বোঝা নামাতে সহযোগিতা চাইলে তাতে সহযোগিতা করাও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»

---

[24] বুখারী, ৫১৭৭; মুসলিম, ১৪৩২।

‘একজন মুমিন আর একজন মুমিনের জন্য ইমারতের ভিত্তি স্বরূপ-যার কোনো অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে থাকে[25]।’

তৃতীয় অধিকার : যখন সে তোমার নিকট সদুপদেশ প্রার্থনা করবে তখন তাকে তুমি সদুপদেশ দিবে। অর্থাৎ যখন কোনো লোক তোমার নিকট কোনো ব্যাপারে নসিহতের উদ্দেশ্যে আসে তখন তাকে অবশ্যই নসিহত বা সদুপদেশ প্রদান করবে। কেননা এটা দ্বীনের একটা অংশ বিশেষ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

‘দ্বীন হচ্ছে সদুপদেশ দান। আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিমদের ইমামদের জন্য এবং সর্বসাধারণের জন্য’[26]।

---

[25] বুখারী, ৪৮১; মুসলিম, ২৫৮৫।

[26] মুসলিম, ৫৫।

আর যদি সে তোমার নিকট সদুপদেশ প্রার্থনা করতে না আসে এবং তার কোনো অসুবিধা ও দোষ ত্রুটি থাকে তাহলে তোমার কর্তব্য হচ্ছে তার নিকট গিয়ে তাকে সদুপদেশ দান করা। কারণ তার মাধ্যমে তুমি মুসলিমদের থেকে ক্ষতি ও অন্যায় নিরোধ করলে। আর যদি সে যা করবে তাতে কোনো ক্ষতি বা গোনাহ না থাকে, আর তোমার মনে হচ্ছে যে অন্য কাজটি তার জন্য বেশি উপকারী হত, তবে সে ক্ষেত্রে তোমার জন্য তাকে নসীহত করা ওয়াজিব নয়; যদি না তোমার কাছে নসীহত চাওয়া হয়ে থাকে। যদি তাতে নসীহত চাওয়া হয়, তবে নসীহত আবশ্যক হয়ে পড়ে।

চতুর্থ অধিকার : যখন কোনো লোক হাঁচি দেয় এবং বলে 'আল হামদু লিল্লাহ' তখন তুমি এই দোয়াটি পাঠ করবে ''ইয়ারহামুকাল্লাহ' বা আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। ''হাচি দেওয়ার সময় সে যে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে আল্লাহর প্রশংসা আদায় করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপই এই কথা বলতে হবে। আর হাঁচি দেওয়ার সময় সে যদি 'আল হামদুলিল্লাহ' না বলে, তা হলে তার এরূপ না বলার কারণেই শ্রবণ কারীর ওপর অনুরূপ দোয়ার ব্যাপারটি বর্তায় না।

আর হাচি দেওয়ার পর যদি উক্ত ব্যক্তি ‘আল হামদুলিল্লাহ’ বলে তা হলে শ্রবণকারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য হবে তার উত্তরে তার প্রতি রহমতের দো‘আ করা। আর সেটা শোনার পর হাঁচিদাতা এই ভাবে দো‘আ করবে, ‘ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া ইয়ুসলিহু বালাকুম’ বা ‘আল্লাহ তোমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং তোমার হাল অবস্থার পরিশুদ্ধি ঘটান।’

আর যদি কেউ হাঁচি দেয় এবং ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলা হয়, আর তার জবাবে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলা হয়, আর তা তিনবার পরপর হয়, তখন যদি চতুর্থবারেও কেউ হাঁচি দেয়, তখন তার জওয়াবে বলতে হবে, ‘আফাকাল্লাহ’ (আল্লাহ তোমাকে রোগমুক্ত করুন)। সেখানে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলা হবে না।

পঞ্চম অধিকার : যখন কোনো লোক অসুস্থ বা রুগ্ন হয়ে পড়বে, তখন তাকে দেখতে যাবে। অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে তার মুসলিম ভাইগণ দেখতে যাবে এটা তার অধিকার। কাজেই মুসলিম ভাইগণ দেখতে যাবে এটা তার অধিকার। কাজেই মুসলিম ভাইদের উচিত এই অধিকারটিকে প্রতিষ্ঠিত করা।

আত্মীয়, সংগী-সাথী অথবা প্রতিবেশী যার সাথে যে রকম সম্পর্ক সেটা অনুসারে তাকে দেখতে যাওয়ার গুরুত্ব নির্ধারিত হবে।

আর তুমি রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে এটা তার অধিকার। তবে এই দেখতে যাওয়াটা হচ্ছে রোগী ও তার রোগের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। কোনো সময় এমন হয় যে, তার অবস্থা খুবই সঙ্গীন তখন তার জন্য বেশী বেশী পেরেশান হতে হয়। আর কোনো সময় অতোটা না হলেও চলে। সুতরাং প্রত্যেক অবস্থায় সে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া জরূরী।

রোগী দেখার সুন্নাত নিয়ম হচ্ছে, তার অবস্থা সম্পর্কে খোজ-খবর নেওয়া, তার জন্য দো'আ করা এবং তার জন্য আশা ও প্রশস্তি মূলক কথা-বার্তা বলা। কেননা সেটা সুস্বাস্থ্য ও রোগমুক্তির অন্যতম কারণ হতে পারে। আর তার জন্য উচিত হবে রুগ্ন ব্যক্তিকে কোনো রূপ ভীতি প্রদর্শন না করে তাওবার কথা স্বরণ করিয়ে দেওয়া। যেমন তাকে এভাবে সদুপদেশ দেবে : 'তোমার যে অসুখ হয়েছে, এটা তোমার মঙ্গলের জন্যই হয়েছে। কারণ রোগ মানুষের যাবতীয় পাপ মোচন করে ফেলে এবং তার মন্দ স্বভাবগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কাজেই এই অবস্থায় তুমি বেশি

বেশি আল্লাহর যিকর ও মাগফিরাত কামনা কর এবং এভাবেই আল্লাহর কাছে দোয়া করার মাধ্যমে অনেক পূর্ণ অর্জন করতে পার।'

ষষ্ঠ অধিকার : যখন কোনো লোক মারা যাবে, তখন তার জানাযায় ও দাফন কাফনে অংশ গ্রহণ করবে। যখন কোনো একজন মুসলিম ভাই মারা যায় তখন তার জানাজায় অংশগ্রহণ করা এটা তার অধিকার এবং এতে অনেক পূণ্যও রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ شَهِدَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»

'যে ব্যক্তি জানাযা অনুসরণ করল এবং জানাযার নামাজ আদায় করল তার জন্য এক কিরাত সওয়াব এবং যে ব্যক্তি জানাযার অনুসরণ করল এবং দাফন কার্যেও শরীক হলো তার জন্য দু' কিরাত সওয়াব। সাহাবাদের মধ্য থেকে কোনো একজন জিজ্ঞাসা

করল : হে আল্লাহর নবী ! দুই কিরাত এই কথার অর্থ কি ? তখন তিনি বললেন, তা হচ্ছে দুটি বিশাল পর্বতের সমতুল্য[27]।'

একজন মুসলিমের ওপর আরেকজন মুসলিমের অধিকারসমূহের মধ্যে আরও হচ্ছে, সে তাকে দু:খ-কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা কোনো মুসলিমকে দুঃখ দেওয়া বড়ই অন্যায় কাজ।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٥٨ ﴾ [الاحزاب: ٥٨]

'যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন স্ত্রীলোকদের বিনা কারণে কষ্ট দেয় তারা নিশ্চয় নিজেদের ঘরে একটি অপবাদ ও পরিষ্কার গুনাহ চাপিয়ে নিল।' [সূরা আল-আহযাব: ৫৮]

---

[27] নাসায়ী, ১৯৯৫। শাইখের ব্যবহৃত শব্দ পুরোপুরি কোথাও পাই নি, তবে কয়েকটি হাদীসে তা এসেছে। সেজন্য আমি সবচেয়ে কাছাকাছি শব্দটি নাসায়ী থেকে গ্রহণ করেছি। [সম্পাদক]

আর অধিকন্তু যে তার ভাইকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، ... وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ» ... «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»

'তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ো না এবং পরস্পর পরস্পরের পিছনে লেগো না, বরং তোমরা 'ভাই ভাই হয়ে আল্লাহর বান্দা হিসেবে জীবন যাপন কর। একজন মুসলিম আরেক জন মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করতে পারে না। তাকে অপমান করতে পারে না (তাকে বিপদে ছেড়ে যেতে পারে না)। তাকে তুচ্ছজ্ঞান করতে পারে না। একজন মুসলিম খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে সে তার মুসলিম ভাইকে অপমান করবে। প্রতিটি মুসলিমের ওপর অন্য মুসলিমের রক্ত, সম্পদ, সম্মান প্রভৃতি হারাম করে দেয়া হয়েছে[28]।'

---

[28] মুসলিম, ২৫৬৪।

মোটকথা, একজন মুসলিমের ওপর অন্য একজন মুসলিমের অধিকার অনেক। সম্ভবত এর সার্বিক অর্থেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই।’ অতএব, যখন সে এই ভ্রাতৃত্ব রক্ষার জন্য প্রস্তুত হবে, তখন সে চাইবে কি করে তার সামগ্রিক ব্যাপারে মংগল হতে পারে এবং সে তার জন্য পীড়াদায়ক জিনিসগুলো থেকে দূরে থাকবে।’

দশ: অমুসলিমদের অধিকার

অমুসলিম বলতে সকল অবিশ্বাসীদেরকেই বুঝানো হয়ে থাকে। এরা চার ভাগে বিভক্ত।

১. হরবী (যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত)।

২. আশ্রয় প্রার্থী।

৩. চুক্তিবদ্ধ এবং

৪. জিম্মি।

সুতরাং যারা প্রকাশ্যভাবে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং শত্রুতা পোষণ করছে, সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমাদের ওপর তাদের কোনো অধিকার নেই।

তবে যারা আশ্রয় তথা নিরাপত্তা প্রার্থী, আমাদের ওপর তাদের অধিকার রয়েছে তাদেরকে সীমিত সময় ও স্থানে নিরাপত্তা সহায়তা প্রদান করা। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

﴿ وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ﴾ [التوبة: ٦]

'যখন মুশরিকদের কেউ তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তখন তাদের সাহায্য কর; যাতে তারা আল্লাহর কালাম শুনতে পারে, অতঃপর তাকে তার নিরাপদের স্থানে পৌঁছে দাও!'। [সূরা আত-তাওবাহ: ৬]

আর যারা আমদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ, চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে, যদি তাদের ও আমাদের মধ্যে সংঘটিত চুক্তির বরখেলাফ কিছু না করে, অর্থাৎ তারা যতদিন চুক্তির ওপর বহাল থাকবে এবং আমাদের কোন অনিষ্ট না করে, আমাদের কাউকে হয়রানি না করে এবং আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে সুব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য।' কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَمۡ يُظَٰهِرُواْ عَلَيۡكُمۡ أَحَدٗا فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٤ ﴾ [التوبة: ٤]

‘তবে মুশরিকদের মধ্য থেকে ঐ সমস্ত লোক যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছো, অতঃপর তারা তোমাদের কোনো ব্যাপারে ক্ষতি সাধন করে নি এবং তোমাদের ওপরে কোনো প্রকার শত্রুতাও করে নি, তা হলে তাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত তোমরা বহাল থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তাকওয়ার অধিকারী লোকদের ভালোবাসেন’। [সূরা আত-তাওবাহ: ৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿ وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمۡ فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَآ أَيۡمَٰنَ لَهُمۡ﴾ [التوبة: ١٢]

‘আর যদি চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর তারা তা ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীনের ব্যাপরে মিথ্যা দোষারূপ করে তা হলে

কাফেরদের নেতাদেরকে তোমরা হত্যা কর- তাদের সাথে তোমাদের আর কোন চুক্তি নেই।' [সূরা আত-তাওবাহ: ১২]

অতঃপর জিম্মিদের কথা। তাদের ওপরে আমাদের এবং আমাদের ওপর তাদের অধিকার রয়েছে। এটা এই জন্য যে, তারা মুসলিমদের দেশেই বসবাস করে থাকে। তারা মুসলিমদেরকে জিজিয়া দিয়ে থাকে এবং এ কারণেই তারা মুসলিমদের সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্য। অতএব, মুসলিম সরকারের ওপর কর্তব্য হচ্ছে ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাদের জান-মাল এবং সম্মানের হেফাজাত করা। আর তারা তাদের (ধর্মানুযায়ী) যে জিনিসগুলোকে নিষিদ্ধ বলে মনে করে তা লংঘনের ক্ষেত্রে তাদের ওপর দণ্ড কায়েম করবে। এছাড়া তাদেরকে হেফাযত করতে হবে এবং তাদের কোনো ব্যাপারে কষ্টদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

আর পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে তাদের ও মুসলিমদের মধ্যে তারতম্য থাকা প্রয়োজন। তাদের কোনো মন্দ স্বাভাব যাতে ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে তাদের ব্যবহৃত ক্রুশ এবং নাকুশ যা তাদের ধর্মীয় নিদর্শন বলে গণ্য তা যেন আমাদের মধ্যে প্রবেশ না

করতে পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আর জিম্মিদের সম্পর্কে যাবতীয় বিধান আলেমদের কিতাবসমুহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাই এই ব্যাপারে আমি আমার এ নিবন্ধকে দীর্ঘায়িত করলাম না।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আর আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার বংশধর, সাহাবীগণ ও সমস্ত মুসলিমের ওপর সালাত ও সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক।

বিষয় সূচী: